পূজোর বেদীতে প্রথম ফুল

মিলনমেলার ফটো এ্যালবাম, টোকা মারুন

জয়নাল আবেদীন

ঋতু চক্রের কি বিচিত্র বাহার-ই না পৃথিবীতে। বিশ্বের এক প্রান্তে জীবন যখন সৌরমন্ডল শিরমণির সৌরভ কৃপণতায় জড়সড়-স্থবির; অন্য প্রান্তে হয়তো তখনই দিবাকরের অবাঞ্ছিত-অবারিত উদারতা আর সীমাহীন বদান্যতায় জীবন ত্রাহি-ত্রাহি; প্রাণ ওষ্ঠাগত। যেই পানির আরেক নাম জীবন- সেই পানি, সেই একই বারির অবারিত ধারা প্লাবণ হয়ে যখন কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যায় শত-শত অমূল্য প্রাণ, বিপুল সম্ভার;- তখনই হয়তো নমনীয় প্রকৃতির বরণীয় আদরে ধরিত্রীর আর এক প্রান্ত - ফুলে-ফলে, সৌরভে মদিরতায় বিমূর্ত হয়ে উঠে। প্রকৃতির এই বিপুল বৈচিত্রতাই হয়তো জীবনকে গতিশীল, বৈচিত্রময় হতে বাধ্য করে। বেঁচে থাকার অর্থ হয়তো, সেই কারণেই যথার্থ হয়ে উঠে।

১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় বাড়ীর সামনের খোলা উঠনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কোন এক অজানা কারণে এই সব আকাশ-পাতাল চিন্তাই মাথায় এসে ভীড় করছিল। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘমুক্ত খোলা আকাশ। অসংখ্য তারার মিটি-মিটি আলো সমস্ত আকাশ জুড়েই। গত কয়দিনের সময়-অসময়ের বিক্ষিপ্ত-প্রবল বর্ষণ স্বিয়বক্ষে সযত্নে ধারণ করে প্রকৃতির সর্বোত্রই সবুজের মোহনীয় পরশ । উঠনে, মাঠে, প্রান্তরে- সবুজ-এর সমারোহ। বসন্তের মিষ্টি-হিমেল দমকা বাতাসে গোলাপ আর বাগান বিলাসের ডাল ও ঝুলে থাকা ফুল-পাতায় আনন্দ স্পন্দন। হালকা জোছনার স্নিগ্ধ পরশে ওরা ঝিকিমিকি। দিগন্ত জুড়ে যেদিকেই চোখ যায় কোথাও এতটুকু মেঘের ছিটে-ফোটা নেই। অথচ এই দু'দিন আগ-পর্যন্ত যেভাবে সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা ছিল, তাতে করে রবিবারে যে একেবারেই বৃষ্টি হবে না, ভাবতেও ভয় হচ্ছিল। অথচ সেটাই আজ সত্য হয়েছে।

১৬ই অক্টোবর রবিবার ছিল *'ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া'*-র পুণর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা। *গ্রেস্টেনস পাবলিক স্কুল*- এর নব-নির্মিত সুবিশাল অডিটরিয়াম, সংলগ্ন বিস্তির্ন *সেড* ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত খেলার মাঠকে কেন্দ্র করে ছিল এই বিশাল আয়োজন। অনুষ্ঠান সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেশীর ভাগ পরিবারকেই দুপুরের কাছাকাছি সময়ে বন্দরে এসে নোঙর ফেলতে দেখা গেছে। ফলশ্রুতিতে অনেক প্রতিভাবান ছোট মণিই ১১:০০টা থেকে শুরু হয়ে যাওয়া অনেক খেলাধূলাতেই অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। শিশু, কিশোর-কিশোরীদের জন্য ছবি আঁকা, দৌড়, মার্বেল দৌড়সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা ছিল। মহিলাদের জন্য ছিল মিউজিকাল চেয়ার।

বড়দের জন্য উন্মুক্ত ছিল মেমোরী প্রতিযোগীতা। এতে প্রতিযোগীদের সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য সদস্য, অতিথি ও তাদের পরিবার সদস্যদের সাথে পরিচিত হতে, তাঁদের নাম জেনে নিয়ে বুদ্ধির কোষে জমিয়ে রাখতে অনুরোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যে প্রতিযোগী তাঁর স্মৃতির কোষ হাঁতড়ে সব চেয়ে বেশী নাম বার করে আনতে পারবে, তাঁকে বিশেষ পুরষ্কার-এর ঘোষনা দেয় হয়।

এই পর্বে মিসেস খায়রুল আলম নিজেকে সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবচেয়ে বুদ্ধিমতি মহিলা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে *'ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া'*-র প্রথম বার্ষিক পুণর্মিলনী(৩০শে জানুয়ারী,২০১১) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ও সম্প্রতি পরলোকগত ভাষা-সৈনিক মরহুম রকিব-উদ্দৌলার আত্মার শান্তি ও তাঁর পিছনে ফেলে যাওয়া বর্ণীল জীবনের উপর স্মৃতিচারণ করেন তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র ডঃ শরিফ উদদৌলা ও কমিটি সদস্য ডঃ জাকিয়া হোসেন। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে, সভাপতি জনাব মোস্তফা আবদুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক আনিস মজুমদারের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট সর্ববামে মরহুম রকিব-উদ্দৌলা।

অনুষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণ পর্বটি ছিল যথার্থই আকর্ষনীয়। এই পর্যায়ে অন্যান্যের মধ্যে স্মৃতিচারণ করেন জনাব গোলাম মওলা, ডঃ সাজেদুর রহমান, জুলফিকার দুলদুল, ডঃ কামাল, ডঃ শফিকুর রহমান ও ডঃ জাকিয়া হোসেন। বক্তারা তাঁদের সময়কার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্বরুপ, বিবিধ দুর্লভ, বিষাদ ও হর্ষময় ঘটনা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলোর সেই বিখ্যাত ডাল থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব ও পরবতী রাজনৈতিক দল, তাদের অবস্থান এবং পরবতীতে তাদের পারস্বরিক সম্পর্ক এবং সেই সাথে সবাই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মজাদার কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন। ডঃ জাকিয়া হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং পরবতীতে শিক্ষিকা হিসেবে স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরের ছাত্রীদের পরিবতীত দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনার উপর আলোকপাত করেন। সবমিলিয়ে এটা ছিল একটা চমৎকার সংযোজন ।

দুপুরের খাবার সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন প্রসিদ্ধ কেটারার ইফফাত আরা সালেকীন (সুচি)। দেড়টার দিক থেকে খাবার পরিবেশন শুরু করা হয়। খাবার পরবতী সুস্বাদু ফিরনীটা ছিল এদিনের খাদ্য তালিকার সর্ব প্রধান আকর্ষণ। বিকালে ছিল বার্ষিক সাধারণ সভা। এই পর্যায়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডঃ জাকিয়া হোসেন। কোষাধ্যক্ষ জনাব কামরুল ইসলাস বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন। পুর্বপ্রতি কমিটি বাতিল করে এইদিন পরবতী দুই বছরের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে যারা আছেন তাঁরা হচ্ছেন সর্বজনাব মোস্তফা আব্দুল্লাহ(সভাপতি) খায়রুল চৌধুরী(সহ-সভাপতি) আনিস মজুমদার(সাধারণ সম্পাদক), কামরুল ইসলাম(কোষাধ্যক্ষ)। সদস্য হিসেবে আছেনঃ জাকিয়া হোসেন, সিরাজুস সালেকীন, শফিকুর রহমান, গোলাম মওলা, হায়াৎ মাহমুদ ও আব্দুল হক। সভাপতি জনাব মোস্তফা আবদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে কমিটির বিগত দিনের সফলতা-বিফলতার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সংগঠনকে যারা বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন এবং এখনো করছেন তাদের সবাইকে কমিটি এবং তাঁর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরিফ, শুভ্রা মুসতারিন ও মাসুদ এবং পরবতীতে হাসান, বনি ও টুটুল। সবশেষে ছিল র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠান। এই পর্বে প্রথম পুরষ্কারটি পেয়েছেন মিসেস কামাল। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সাংস্কৃতিক পর্বের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুস সালেকীন।

অনুষ্ঠানে দুপুরের খাবারের প্রাসঙ্গিক আয়োজন, পরিবেশন, গ্রহণ ও পরিসমাপ্তিতে যথেস্ট সময় গেছে বলে মনে হয়। খাবারের ব্যবস্থাপনাটা যদি একটু সহজ করা যেত- তবে অন্যান্য বিষয়ে আরও সময় এবং সেই সাথে মুল অনুষ্ঠানটা মনে হয় আরও আকর্ষনীয় হয়ে উঠতো। অন্ততঃপক্ষে প্যাকেট খাবারের ব্যবস্থাটাও এক্ষেত্রে অনেক সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারতো বলে অনেকে মনে করছেন।

অনুষ্ঠানে অনেক গুণী শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। ব্যাপারটা অবশ্যই গৌরব ও আনন্দের। তাঁরা সঙ্গীতের আনুষাঙ্গিক ***ইনস্ট্রুমেন্ট***-সহ যখন অনুষ্ঠানে উপস্থিত, তখন সময়ের অভাবে সেই পর্বকে

সঙ্কুচিত করাতে শ্রোতা-দর্শক যেমন হতাশ হয়েছে, তেমনি প্রস্তুতি পরবর্তী পরিবেশনার সুযোগ বঞ্চিত শিল্পীদের সেটা কতটা আনন্দ দিতে পেরেছে জানতে পারিনি। ভবিষ্যত কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আর একটু সজাগ হলে, আমরা সবাই মনে হয় আরও একটু বেশী আনন্দিত হতে পারবো।

অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছেন অনেকেই। কমিটি সদস্য-এর বাইরে থেকেও যারা এদিনের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে অনবদ্য অবদান রেখেছেন সেই তালিকায় অন্যান্যের মধ্যে আছেন সর্বজনাব আব্দুল মান্নান, মাহমুদুল হক বাদল, ইনতিসার, অনিকা, ওয়াসিফ রহমান, শামিন আব্দুল্লাহ ও আবির রহমান। ইফফাত আরা সুচির সাহায্যের হস্তও মনে হয় তাঁর জন্য নির্ধারিত পরিধির বাইরে প্রসারিত হতে দেখা গেছে। এই সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

যে সব ক্ষেত্রে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে, তাদের জন্য ভবিষ্যতে যদি নামমাত্র মূল্যেও কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যায়; তবে সেটা ভবিষ্যতে তাদের এবং সেই সাথে অন্যদেরও অনুপ্রেরণার কারণ হতে পারে বলে, অনেকে মন্তব্য করেছেন।

সব মিলিয়ে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। সেই সাথে সুদীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে যারা এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার জন্যই রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

পাদটিকাঃ

সংখ্যা লঘিষ্টরা সংঘবদ্ধ হয়। সেটা বিবিধ কারণে। কখনো সেটা অস্তিত্বের প্রয়োজনে, কখনো সমষ্টিগত সুযোগ ও দাবী আদায়ের স্বাভাবিক প্রেরণায়। আবার কখনো বা অনন্য-বিশিষ্ট্য গোষ্টির সদস্য বোঝানোর সুপ্ত-অনুচ্চারিত-অঘোষিত অভিপ্রায়ে। সঙ্গতঃ কারণেই এই একত্রিভুত হওয়াটা প্রয়োজনীয়। সংখ্যাটা বড় হলে, সাধারণ ভাবে সমস্যাটাও বড় হয়। একত্রিত হওয়াটা তখন আর সহজ হয় না। মজার ব্যাপার হলো, সংখ্যাটা যখন ছোট থাকে তখন সেটাকে বড় করতে আমরা সচেষ্ট হই। আবার যখন বেড়ে যায়, তখন তাকে ছোট করতেও আমরা এতটুকু বিব্রত হই না। এই একই গড়া-ভাঙার খেলাই চলছে প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত; সর্বত্র। অনেকটা ঐ প্রকৃতির মতোই।

মনে আছে, '৯০-এর শেষের দিকে সিডনীর ইনার ওয়েষ্টের একটা ***সাবার্বে*** যখন আমাদের অস্থায়ী নিবাস, তখন সেখানে বাঙালীর সংখ্যাটা খুব একটা বেশী ছিল না। সম্ভবতঃ তখন সবার সাথেই সবার একটা চমৎকার যোগাযোগ ছিল। আমরা কেউ-ই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, আওয়ামী বা জাতীয়তাবাদী দল ছিলাম না। মনে হয় সবাই আমরা তখন মনে প্রাণেই বাঙালী ছিলাম। সেই দিন আর নেই । এখন সংখ্যা বেড়েছে, প্রয়োজনও বেড়েছে। সেই সাথে আমরাও বিকশিত হয়েছি বিবিধ ভূষণে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপিট। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী অভিবাসিদের মধ্যে সম্ভবতঃ কোন-না কোন ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তারপরও যখন বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-ইনষ্টিটিউড ও বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে সংগঠন গড়ে উঠেছে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে ছিল; সেটা মনে হয় ঐ বিশালত্বের কারণেই । চেয়েছে অনেকেই, তবে এগিয়ে আসতে সাহস করেনি। সব চেয়ে বড় যে সমস্যাটা ছিল, সেটা মনে হয়, "পুজোর বেদীতে প্রথম ফুলটা, চড়াবে কে?" মনে আছে, *'ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন'* নিয়ে যখন জল্পনা-কল্পনা এবং অঘোষিত একটা কমিটির কথা শোনা যাচ্ছে, তখন বেশ কয়েকটা ***ই-মেইল*** নেট-এ ভেসে বেড়াচ্ছিল। যার মর্মার্থ অনেকটা এই রকমঃ **'কারা এরা। চিনেন নাকি? কোথা থেকে, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।'** যে বা যারা এই প্রশ্নের হোতা, তাদের উস্মার কারণটা অভাবনীয় নয়। সহানুভূতির সাথে বিবেচ্য। তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন নেই

কোন। সমস্য শুধু একটাই, এদের সংখ্যাটা এতই বড়, এদের অনেকেরই রাজনৈতিক শক্তি ও অনুভূতি এতই প্রমত্ত যে, পুজোর বেদীতে ফুল চড়ানোর ঠেলাঠেলিতে প্রতিমারই ভুলুণ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশী। সেই অর্থে বর্তমান কমিটিকে সাধুবাদ জানাই। বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার কাজটা শেষ হয়েছে। এখন এগিয়ে যাবার পালা। সংখ্যার বিশালত্ব সমস্যার কারণ হতে পারে। তবে সুষ্ঠু ও সঠিক হাতের যথার্থ প্রয়োগে সেটা সম্পদ হয়ে উঠতেও দেরী করে না। চীনের বর্তমান প্রগতির দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারইতো মনে হয় প্রতিচ্ছবি দেখি।

যাদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক সদিচ্ছায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবং যাদের সাহায্য সহযোগীতায় মাঝ-বসন্তের চমৎকার এই দিনে এমন সুন্দর একটা পুণর্মিলনী হয়ে গেল, তাদের সবাইকে আবার জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

জয়নাল আবেদীন- সিডনী, অক্টোবর, ২০১১.

jaynalskabedin@gmail.com

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকামারুন